নাহিদা আশরাফি

বাবার চাদর ও একজন জালাল চাচা

আজিমপুর কবরস্থানের ঘাস লতাপাতা থেকে শুরু করে বেঞ্চে শুয়ে থাকা বেড়ালটা, এমনকি বেড়ালের বাচ্চা তিনটা পর্যন্ত আমাকে এমনভাবে চেনে যে এক সপ্তাহ দেখা না হলে পরের সপ্তাহে যাওয়া মাত্রই পায়ের কাছে এসে এমন মিউ মিউ শুরু করবে যেন কত যুগ পরে দেখা হলো ওদের সাথে। গোড়খোদক যারা আছেন কেন জানি তারাও বিশেষ সমীহ ও সম্মান করে আমাকে। নাম ও বেশধারী কিছু হুজুর আছেন তারা অবশ্য রীতিমত ভয় পায়। কারণটা খুবই অজ্ঞাত। আজ অবধি তাদের কারোর সাথেই খারাপ আচরণ করার কোন রেকর্ড আমার নেই। আমি আমার মতোই কবরস্থানে যাই, চুপচাপ বসে থাকি, বেড়াল, কুকুরের জন্য নেয়া বিস্কিটগুলো ওদের খাইয়ে দিই, ওরা ওদের মত খেয়ে আমার চারপাশে লেজ নাড়ে আর মহানন্দে ঘুরতে থাকে। আমি বাবার সাথে গল্প করি। গল্প শেষ হলে উঠে আসি। ওরা আমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। বিক্ষিপ্ত মন তখন কিছুটা হলেও শান্ত হয় আমার।

কবরস্থানে সন্ধ্যে নামে ঝুপ করে। বসে থেকে থেকে কখন সন্ধ্যে নেমেছে খেয়ালই করিনি। হঠাৎ কয়েকটা গুলি আর বোমার শব্দে চমকে উঠলাম। কোথায় কি হলো? আরে! এই আওয়াজ তো কবরস্থানের ভেতর থেকেই আসছে। আমার কয়েকশো গজের মধ্যে একটা বোমা পরতেই আমি বাবার কবর আর পার্শ্ববর্তী কবরের মাঝখানে লুকালাম। বোমা বিষ্ফোরণের ধোঁয়া, পুলিশের সাইরেন আর গুলির শব্দে আমি যখন নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রায় সামনে দিয়ে হেঁটে আসতে দেখেছি ঠিক তখন একটা ভারি কণ্ঠের আওয়াজে চমকে উঠলাম।

—আম্মা, ঘাবরাইয়েন না। আসেন আমার সাথে আসেন।

আরে! এ তো জালাল চাচা। অনেকদিন পর দেখলাম। জালাল চাচা এখানকার অনেক পুরনো গোড়খোদক। মাঝখানে অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতালে তাকে দেখতেও গিয়েছিলাম। ফেরার আগে তাঁর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিতেই.....

—আম্মা ট্যাকা দিয়া কি করুম?

—রাখেন চাচা। অসুস্থ মানুষ। কখন কোন কাজে লাগে।

—ট্যাকা লাগবোনা আম্মা। আপ্নে বরং আমারে মোটা দেইখা একটা শীতের চাদর কিন্যা

দিয়েন। এইখানের পাতলা কম্বলে আমার শীত মানে না।
—আমি চাদর নিয়ে আসবো চাচামিয়া। আপ্নে টাকা রাখেন।
বাবার একটা মোটা উলেন চাদর ছিলো আলমারিতে। ভাঁজে ভাঁজে নষ্ট হয়ে যাবার চেয়ে কারোর উপকারে লাগলে বাবাই বেশি খুশি হবেন। পরদিনই চাদরটা দিয়ে এলাম জালাল চাচাকে। চাদরটা পাবার পর তাঁর মুখে যে আনন্দের আলোটুকু দেখেছি এতো নির্মল নিষ্পাপ আলো আজকাল চোখেই পড়েনা। এরপর অবশ্য মাসদুয়েক নিজের ও পরিবারের সবার অসুস্থতার কারনে জালাল চাচার আর খবর নেওয়া হয়নি।
—আসেন আম্মা, দাঁড়াইয়া থাইকেন না। সময় খুব কম। আপনারে গেট পার কইরা দেই। আমি চাচার পিছন পিছন প্রাণভয়ে বলতে গেলে দৌড়াতে থাকি। মধ্য রাস্তায় এসে হঠাৎই চাচা তাঁর দু'হাত পাখির মতন মেলে দিলো। আর তখনই আমি খেয়াল করলাম তাঁর দু'হাতে বাবার চাদরটি ধরা আর তা পাখির ডানার মতন বিস্তৃত হয়ে আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি তাকাতেই চাচা এমন ভাব করলেন মনে হলো চাদরটা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে গায়ে দিচ্ছেন। একটু পরেই কবরস্থানের পশ্চিমের গেট চোখে পড়লো।
—আম্মা গেটের কাছে আইসা পরছি। এইবার আপ্নে নিজেই যাইতে পারবেন। দৌড়ান আম্মা। তাড়াতাড়ি যান।
—চাচা আপনি?
—আপ্নে যান আম্মা। এখন প্রশ্ন করনের সময় না। আমার জন্য ভাইবেন না। আর একটা কথা আম্মা, এমন অসময়ে কবরস্থানে আর কখনও একলা আইসেন না। দিনকাল ভালা না।
আমি বিস্ময়ে লক্ষ করলাম চাচা আমাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সেই ধোঁয়া আর সন্ধ্যের এক রহস্যময় আলোর মধ্যে মুহূর্তেই হারিয়ে গেল। অসহনীয় উত্তেজনা আর সম্ভবত বেঁচে থাকার আনন্দে আমি গেটের কাছে এসে মাথা ঘুরে পরে গেলাম। জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমাকে ঘিরে আছে নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য।
এরপরের ঘটনা অতি সংক্ষেপে যা শুনলাম তাতে তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। আজ দুপুর থেকেই নাকি কিছু জঙ্গি আশ্রয় নিয়েছে এই কবরস্থানে। প্রায় শ'খানেক পুলিশ, র‍্যাব ও নিরাপত্তাকর্মী পুরো কবরস্থানকে বিকেল থেকে ঘিরে রেখেছেন। সন্ধ্যে নাগাদ অবস্থা বেগতিক দেখে জঙ্গিরা বেপরোয়া গুলি চালানো শুরু করে। নিরাপত্তাকর্মীরা কবরস্থানের ভেতরে ছদ্মবেশে এসে খুব ট্যাকনিক্যালি জিয়ারত করতে আসা বেশিরভাগ সাধারণ জনগণকে বের করে নিয়েছে। কিন্তু খুব আশ্চর্যজনকভাবে আমি তাদের চোখেই পড়িনি।
যাই হোক, যেভাবেই হোক আমি বেঁচে আছি; এই আনন্দেই আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। বেঁচে থাকার আনন্দ একমাত্র আমার মতন মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখা মানুষই বোঝে। সেই আনন্দকে

সাথে নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িতে করে বাসায় রওয়ানা দেবো হঠাৎই দেখি শমশের মিয়া দৌড়ে আসছে। জালাল চাচা অসুস্থ হবার পর শমশের মিয়াই বাবার কবর দেখাশুনা করে।

—আপা। ক্যান্নে কি। আমি তো স্বপ্নেও ভাবি নাই আপ্নে ভিত্রে আটকা পড়েছেন। পুলিশ ভাইরা আপ্নেরে ধরাধরি কইরা যখন বাইরে নিয়া আসলো তখন আমিই আপ্নেরে চিইন্না তাগো কইলাম। আপা আপ্নের মতন ভালা মাইনষের এমুন বিপদ হওন ঠিক না। এইগুলান জাহান্নামে যাইবো।

—শমশের মিয়া, দেশ ও জাতির শত্রুরা এমনিতেই তলিয়ে যাবে। এখনো ভালোর পাল্লাটাই ভারী। নইলে কবেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।

—তা ঠিক। তয় আপা আপ্নেরে দেখার পর হইতেই অবাক হইয়া ভাবি, রাখে আল্লা মারে কে? নইলে যেই হারে ওরা গোলাগুলি করতাছিলো আর বোমা ফুটাইতেছিলো তার মইধ্যে বাইচ্চা থাকন অসম্ভব।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। অই যে বললাম ভালোর পাল্লাটাই এখনো ভারী। কিছু নিঃস্বার্থ মানুষ এখনো আছে বলেই আমরা টিকে আছি। আজ জালাল চাচাকে না পেলে কি যে হতো। মনে হয় বাবার কবরের পাশেই আমার লাশ পরে থাকতো। জালাল চাচা অনেক বড় বিপদ মাথায় নিয়ে আমাকে কোথা থেকে কিভাবে যে নিয়ে এলো গেট পর্যন্ত তিনি জানেন আর মঙ্গলময় জানেন। একটু সুস্থ হয়েই জালাল চাচার সাথে দেখা করতে হবে। শমশের মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখ প্রায় সোয়া ইঞ্চি হা হয়ে আছে।

—এই সব কি কন আপা? আপ্নে মনে হয় এখনও ঠিক সুস্থ হইবার পারেন নাই। তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়া জিরান। কি সব উল্টাপাল্টা কইতাছেন।

—আমি ঠিক আছি শমশের মিয়া। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আপ্নি বরং জালাল চাচাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়েন।

—আপা। জালাল চাচা গত মাসে মইরা গেছে। আগামীকাল তাঁর চল্লিশা। আপ্নের আব্বার কবরের দুই সারি আগেই তাঁর কব্বর।